রাঙা শাড়ী

(Edmund Mckennaর ইংরেজি হইতে)

আমি বোম্বাই-প্রবাসী। সেখানকার কথাই বল্‌তে বসেছি। ট্রামে চড়ে সকাল বেলা আপিস যেতে যেতেই প্রথম সে রাঙা শাড়ীখানা দেখেছিলাম। মানুষের মনে এক এক সময় কিসের যে হাওয়া আসে, নেহাৎ ছোটখাট পথে-দেখা সামান্য জিনিসগুলোও তখন একটা বিশেষ রূপ ধরে বসে। তেম্‌নি একটা হাওয়ার ধাক্কাই একদিন আমার মনে লেগেছিল, সে দিনই আমার চোখের উপর আমি দেখ্‌লাম যে আজ সাত মাস ধরেই প্রতি সকালে একখানা রাঙা শাড়ী ঐ ভাড়াটে বাড়ীটার মেটে বারাণ্ডার বাঁশের আন্‌লায় দোলে। এই সাত মাস হল আমি চাক্‌রী নিয়েছি; কাজেই এর আগে যে আরো কত দিন ভিজে শাড়ীখানা সকালের রোদে গা মেলে পড়ে থেকেছে, তা আমি জানি না। তবে আমার কেমন একটা বিশ্বাস—যেন অনেক কাল ধরেই এই রাঙা শাড়ীর উপর সূর্য্যের আলো খেলা করেছে। যে জিনিস মানুষের চোখে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে, সে যে কোনো কালে ছিল না একথা মানুষ সহজে মনে কর্‌তে পারে না।

কোন্ কিশোরী কুমারীর শাড়ী না জানি? মেয়েটির নামই বা কি? কল্পনার দৌড় ত আমার কম নয়। আমি মনে মনে তার নাম রাখ্‌লাম মালতী। তার ছিপ্‌ছিপে পাতলা চেহারাটি আমার মনের মধ্যে ফুটে উঠ্‌ল; বড় বড় হাসিহাসি চোখ, রেশমের মত নরম একটু কটা একপিঠ চুল, কিন্তু কোমর ছাড়িয়ে পড়ে না, ছোট্ট চিবুকের উপর পাতলা দুটি ঠোঁট। পাতলা সরু নাকটির গঠন ভারি সুন্দর, কিন্তু খাঁড়ার মত উঁচু নয়। গাল দুটি শীতকালে ফেটে ডালিমের মত লাল হয়ে ওঠে, অন্য সময় বেশ চিক্কণ। একহারা গড়নের ছোটখাট মেয়ের চেহারায় এম্‌নি নাক চোখই বেশ মানায়, তাই আমি মনে মনে আমার মালতীকে এম্‌নি করে অল্পে অল্পে গড়ে তুল্‌লাম।

রোজই আমি শাড়ীখানা দেখ্‌বার আশায় উৎসুক হয়ে থাক্‌তাম। আমার একটা সুবিধাও ছিল ভাল রকম। সেই ভাড়াটে বাড়ীখানার কোণাকুণি খুব কাছেই ট্রাম দাঁড়াবার জায়গা ছিল, তার পরেই একটু মোড় ফিরে যেতে হত। কাজেই আমি রোজই বেশ ভাল করে অনেকক্ষণ ধরে সেখানা দেখ্‌তে পেতাম। ঘুরে ঘুরে শাড়ীর জরির পাড় কত জায়গায় কুঁকড়ে গিয়েছিল, রেশমী গঙ্গাজলী আঁচলের কাছে অনেকখানি রিপুকরা; মাঝে মাঝে লম্বা সেলাইয়েরও অভাব ছিল না। শাড়ীর আঁচলের রঙের চেয়ে রিপুর সুতোর রংটা বেশী ঝক্‌ঝক্ কর্‌ত। এই সব নানান্ খুঁটিনাটির একটাও আমার নজর এড়ায় নি।

বাড়ী থেকে ট্রামে উঠে একখানা নভেল হাতে করে নিবিষ্টচিত্তে পড়্‌তে সুরু কর্‌তাম। পাতাখানা প্রায়ই থাক্‌ত সামনের বেঞ্চির উপর। কিন্তু গল্পের স্রোতে আমার মন হাজার মাইল ভেসে ভেসে গেলেও, নায়িকার হৃদয়-বেদনা জমাট নিবিড় হয়ে উঠ্‌লেও, এমন কি চরম শত্রুর চক্রান্তে নায়কের অবস্থা পরম সঙ্গীন হয়ে পড়্‌লেও আমার মালতীর রাঙা শাড়ী হাতছানি দেবা মাত্র আমি বেদনার বোঝা সমেত নায়িকাকে একপলা নিরাশার জলে ফেলে দিয়ে শত্রুর হাতে মরণোন্মুখ নায়কের প্রতি কিছুমাত্র করুণা না দেখিয়ে খাড়া হয়ে বসে সেই বাঁশের আন্‌লায় দোলানো পরিচিত শাড়ীখানির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ কর্‌তাম। একটি দিনও শাড়ী সেখান থেকে নড়্‌ত না। মুখে আমার একটু হাসির রেখা দেখা দিত, মন কল্পনার রথে কত অজানা অচেনা পথে ঘুরে বেড়াত।

একদিন হঠাৎ পাচকের কৃপায় আমার দেরী হয়ে গেল। ভাড়াটে বাড়ীখানার কাছে এসে দেখি—রাঙা শাড়ী আজ আর বাঁশের আন্‌লায় নেই। আন্‌লার পিছনের জান্‌লায় এক বুড়ো বসে আছে। দেখেই বুঝ্‌লাম, লোকটা অন্ধ; দৃষ্টিহীনের অর্থহীন শূন্যদৃষ্টি তুলে সে এমন করে সশব্দ ট্রামগাড়ার দিকে চেয়ে আছে যেন তার নিরর্থক চোখ-দুটোকেও আজ শোনার কাজে লাগিয়ে দেবে! আজকার এ ব্যাপারখানা সম্পূর্ণ নূতন, আমি এ রকম আশাও করিনি। অন্ধবুড়োর কথা বল্‌ছি না, বল্‌ছি রাঙাশাড়ীর অন্তর্ধানের কথা। যাক্, কি আর করি? বুদ্ধিমানের মত যুক্তিতর্ক খাটাতে বস্‌লাম; এম্‌নি করেই ত মানুষ ফাঁকি দিয়ে নিজেকে ভোলাতে চেষ্টা করে। ভাব্‌লাম—আমি আজ দেরী করে বেরিয়েছি, রাঙা শাড়ী হয়ত এতক্ষণ

সুন্দরীর অঙ্গে উঠে অন্তঃপুরে ঘরের কাজের মাঝখানে শোভা পাচ্ছে। সকাল সকাল ট্রাম ধর্‌তে পার্‌লে নিশ্চয়ই দেখা মিল্‌ত।

কিন্তু সেই পুরোনো বাড়ীর বাঁশের আল্‌নায় আর সে শাড়ীর দেখা মিল্‌ল না। কত সপ্তাহের পর সপ্তাহ আমি আশায় হৃদয় পূর্ণ করে প্রতি সকালে সেই মেটে বারাণ্ডাটার দিকে চেয়ে দেখ্‌তাম, কিন্তু প্রতিদিনই নূতন করে নিরাশ হতাম। তারপর কতদিন কেটে গেল। এখনও কিন্তু আমি মাঝে মাঝে অতীতের কথা স্মরণ করে ভাবি—রাঙাশাড়ীরই বা কি হ'ল, মালতীরই বা কি হ'ল? সেই পাতলা ছিপ্‌ছিপে কিশোরী মালতী, যার এক-পিঠ রেশমের মত চুল, সে গেল কোথায়? মৃত্যু বুঝি তাকে হরণ করে রাঙাশাড়ী সুদ্ধ রাঙা মেঘের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছে, না কোনো কেরাণীবাবুর বওয়াটে ছেলে একরাত্রি রঙিন আলো জ্বেলে তাকে টেনে নিয়ে গিয়ে রান্নাঘরের কালিঝুলির মধ্যে বাসা বেঁধে দিয়েছে?

যাক্, পরে সবই জানা গেল! সেদিন প্রথম বসন্ত-সমীর দেখা দিয়েছেন। দিনটি বেশ মন-ভোলানো, চোখ-জুড়োনো। এম্‌নি দিনে বড় সাহেব কিসের একটা বিল আদায় কর্‌তে আমাকে সেদিনকার মত কলম পেষা থেকে মুক্তি দিলেন। রাস্তায় বেরিয়েই টের পেলাম, যেখানে অর্থ সংগ্রহ কর্‌তে আমায় পাঠানো হচ্ছে সে জায়গাটা রাঙা-শাড়ীর-মোড় থেকে বড় বেশী দূর নয়। মোড়ের দক্ষিণদিকে ট্রাম লাইনের থামটার কাছে আমি চট্ করে নেমে পড়্‌লাম। উল্টোদিকের আর একখানা ট্রাম ঘাড়ে এসে পড়বার ভয়ে চাপ্‌কান উড়িয়ে ছুটে রাস্তা পার হচ্ছি, এমন সময় দেখি একটি মোটা সোটা শক্ত রকমের প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক একখানা কালো চেক চাদর মুড়ি দিয়ে পথের ধারে দাঁড়িয়ে আছে। বাঁ হাতে একখানা বেতের চাঙারি চেপে ধরে ডান হাতে গায়ের কাপড়টা টেনে দিতে গিয়ে তার চেকচাদরখানা একটু গুটিয়ে এসেছে। হঠাৎ আমার চোখ পড়্‌ল তার সিঁদুরের টিপপরা কপাল আর টাক-মাথার দিকে। চোখ দুটোকে বিশ্বাস হচ্ছিল না, কিন্তু সত্যিই দেখ্‌লাম, আমার মাল্‌তীর সেই রাঙা শাড়ীই বুড়ীর ওই মস্ত [illegible]

এযে ভুল হবার জো নেই! গঙ্গাজলী আঁচলখানায় ওই ত সেই চক্‌চকে রেশমী সুতোয় রিপু-করা জরির পাড়ও ঠিক তেম্‌নি কুঁক্‌ড়ে কালো হয়ে এসেছে। হায়রে আমার মানসী মালতী! কোনোখান দিয়েই যে এ আমার মনের মানুষটির কাছে পৌঁছায় না!

পথের কষ্টে বোঝা নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে আমার দিকে সে এগিয়ে আস্‌তেই আমি তাকে ভাল করে দেখ্‌বার জন্যে তার মুখের দিকে চোখ তুলে চাইলাম। মস্ত বড় চৌকো একখানা মুখ। মুখে কোনো লালিত্য নেই, একেবারে কাটখোট্টা রকমের। চোয়ালের হাড় বেশ বের-করা। মুখ দেখ্‌লে মনে হয়, এম্‌নি মানুষই এ জগতে জীবন-সংগ্রামের মধ্যে টিঁকে যায়। কোনো দুঃখ, কোনো আঘাতই এদের গায়ে লাগে না। কিন্তু মেয়েটির সমস্ত মুখের কঠিন ভাবের আড়ালে তার চোখের দৃষ্টির কাছে আর-একটা এমন ভাবের সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল, যেটা তার কঠোর মুখের সঙ্গে মোটেই খাপ খায় না।

আমি সাহসে ভর করে তার সঙ্গে কথা কইবার সুযোগ খুঁজ্‌তে লাগ্‌লাম। হঠাৎ শীতটা কমে যাওয়ায় গরীব-দুঃখীদের কষ্ট অনেক কমেছে এই কথাটা পাড়ব মনে করে বল্লাম, "হ্যাঁ গা বাছা, শিবমন্দির থেকে পুজো করে এলে বুঝি? শীতটা কমে আজকাল অনেক সুবিধে হয়েছে না?"

সে বেশ সপ্রতিভ ভাবেই বল্‌লে, "হ্যাঁ, তা হয়েছে বৈকি! বসন্তকাল পড়ুল, হাওয়া গরম হয়ে উঠেছে, দেশে আমাদের এতদিনে রাত পোয়ালে পাখীর ডাকে এক নিমেষ ঘুমোবার জো নেই।"

তাইত! এর গলার স্বরটাও যে দেখ্‌ছি মুখের চেহারার সঙ্গে খাপ খায় না। সে স্বরে এখনও তার অতীত যৌবনের সুর বেজে উঠ্‌ছে। এমন মোলায়েম গলায় বার্দ্ধক্যের রং সহজে ধরে না।

কিন্তু আসল কথাটাই যে বাকি। রাঙা শাড়ীর কথাটা পাড়ি কি করে? আর খানিকক্ষণ কথাবার্ত্তা কইতে পেলে কোনো রকমে তার কথাটা টেনে আন্‌তে পারি, তাহ'লে নেহাৎ হট করে একটা বেখাপ্পা কথা বলাও হবে না।

দু-চার কথার পরে বললাম, "এ পথটা কি এবড়ো-

খেব্‌ড়ো বাবা, তাড়াতাড়ির সময় নূতন লোকের এমন পথে হাঁটাই দায়।"

সে খুব আগ্রহের সঙ্গে বলে উঠ্‌ল, "আমার বাপু কিছু হয়চয় না। আমার চোখ বুজে হাঁট্‌তেও এক পা বাধে না। আজ কত বচ্ছর বারো মাস তিরিশ দিন ওই পথে দুবেলা আনাগোনা করেছি।"

"ও, এই পাড়াতেই বাড়ী বুঝি?"

"হ্যাঁ, ওই যে কোণের মেটে বাড়ীটা, ওখানেই ত এতকাল কাটিয়ে এলাম।"

কথাটা বলে সে চট্ করে একবার মুখ ঘুরিয়ে সেই আমার পরিচিত বাড়ীটার দিকে খুব পরিচিত প্রিয় জনের মত তাকালে। তারপর বল্‌লে "বাড়ীর ভাড়া বেড়ে গেল, কাজেই এত কালের ঘর দোর ছেড়ে একটা ছোট ঘর দেখে উঠে যেতে হ'ল। রাস্তার ঘড়ঘড়ানিটা দুদিন কাণে একটু সয়ে গেলে বাড়ীখানায় বেশ নিশ্চিন্তি থাকা যায়, কোনো আপদ বালাই নেই। আমাদের কর্ত্তা ত ট্রামের ঘড়ঘড় শুন্‌তে পেলে বাঁচে। অন্ধ মানুষের খুটখাট টুকটাক একটু শব্দ শুন্‌তে পেলে হয়। আশ্চর্য্যি টান বাপু!"

আমি বল্‌লাম, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই পথে যেতে ওই জান্‌লার ধারে একজন অন্ধকে দেখেছি যেন মনে হচ্ছে।"

কেমন একটা স্নেহমাখা মোলায়েম সুরে সে ব্যস্তভাবে বলে উঠ্‌ল, "ওই, ওই গো, আমার কর্ত্তাকেই দেখেছ।"

আমি হঠাৎ বলে বস্‌লাম, "আচ্ছা, ও বাড়ীতে বাঁশের আনলায় একখানা লাল কাপড় রোজই শুকোত না?"

বাধা দিয়ে সে বল্‌লে, "আমারই সে কাপড় গা! ওমা, তুমি তাও নজর করে চেয়ে দেখেছ? আচ্ছা যা হোক।" গলার স্বরে একটুখানি গর্ব্বের আমেজ দিয়ে সে আবার বল্‌লে, "আজ এই পঁচিশ বৎসর আমি লাল কাপড় পরে কাটালাম।"

পঁচিশ কথাটার উপর এতখানি ঝোঁক দিয়ে উচ্চারণ কর্‌ল যেন চব্বিশ কথাটা নেহাৎ খেলো।

আমি খুব বিস্মিতভাবে বল্‌লাম, "পঁচিশ বচ্ছর!"

"হ্যাঁ, পঁচিশ বৈকি! পঁচিশ হতে আর কমটা কি? এই আস্‌চে বৈশাখে পুরো পঁচিশ বছর হবে। কায়্‌খানার কাজে সে বছর বৈশাখ মাসে ওঁর চোখ দুটি গেল। সেই সবে মাস খানেক হল দ্বিরাগমন করে ঘর করতে এসেছি। দেশাই আমার জন্যে এক খান রাঙা কাপড় কিনে-এনেছিল, তার পাড়টা জরির। লাল রংটা বড় ভাল বাস্‌ত,—আর আমাকেও কম নয়।"

"সেদিন থেকে বুঝি তুমি ওকে খুসী কর্‌বার জন্যে লাল কাপড় পরে বেড়াও।"

মুখখানা গম্ভীর করে আস্তে আস্তে ঘাড় নেড়ে সে আমার কথায় সায় দিল।

আমি বল্‌লাম, "অত দামী কাপড় পর্‌তে পয়সার টান-টানি হয়নি কখনো?"

মুখ ভার করে মেয়েটি উত্তর দিল, "হ্যাঁ তা কাপড়ের দাম তদিনকার দিন চড়ছে।"

আদত কথার ঠিক উত্তর না পেয়ে আবার বল্‌লাম, "এই বল্‌ছি কি—তা কখনো শাদা কি কালো কাপড়... কি বলে...লাল বলে চালাবার চেষ্টা কর নি?"

কথাটা বড় বেহায়ার মত শোনাল বটে, কিন্তু না বলে থাক্‌তে পার্‌লাম না।

"হ্যাঁ, তাও একবার করেছিলাম।"

"তা' কি হ'ল তাতে?"

মেয়েটি আমার মুখের উপর এমন একটা দৃষ্টি তুলে ধর্‌ল, এমন সম্পূর্ণভাবে আমাকেই সে দেখ্‌ল, যে, আমার মনে হ'ল এতক্ষণ যেন সে আমার দিকে তাকায়ই নি।

সে বল্‌লে "অন্ধের কান্না কখনো দেখেছ কি?"

সত্যিতার কথায় আমার বুকের ভিতর কে যেন একটা ঘা দিল। আমার মনের ভাবটা বুঝ্‌তে তার নিশ্চয়ই বাকি ছিল না। মনে হ'ল যেন আমায় ব্যথা দিয়ে তার দুঃখ হচ্ছে।

সে বল্‌লে, "দেশাইয়ের আঙুলের ডগায় যেন যাদু আছে। হাতে ছুঁয়েই সে চোখের কাজ করে; সব ফাঁকি ধরে ফেল্‌তে পারে। শুধু ওই হাতের জোরেই কত কাজ করে, জান?"

তার হাতের ঝুড়ির মুখের চাপাটা তুলে তার মধ্যে থেকে একটা কাঠের গরু না ভেড়া কি একটা তুলে ধরে সে আমায় কাছে ডেকে বল্‌লে, "এই দেখ কেমন কাজ করেছে।" ঝুড়ির ভিতর আরো বারোচোদ্দটা ঐ রকম খেলনা ছিল।

মেয়েটি বল্‌লে, "নিত্যি বসে বসে এইসব করে, এক-দিনও কামাই নেই কাজের।"

"আর তুমি নিয়ে নিয়ে বাজারে বেচে এস। বাঃ দিব্যি ত।"

আগের মত তেমনি একটু গর্ব্বের সঙ্গে সে উত্তর দিল, "হ্যাঃ, পাঁচ বছরে পাঁচটাকাও বেচেছি কি না সন্দেহ।"

"তবে ও-গুলো নিয়ে করো কি? বাজারে বিক্রি হয় না?"

"না, ওই বেচে খাওয়া-পরা আর চল্‌তে হয় না। পাঠ-শালে হাঁসপাতালে পথে ঘাটে ছেলেপিলেদের বিলিয়ে দি। এই পাঁচ বছরে আমি যত খেলানা বিলিয়েছি, সব কটা বড় মানুষের ঘরনীগিন্নি মিলেও তা পারে নি।"

"তোমার স্বামী টের পান না?"

"না, না, তা কি হয়—তার ও-সব দিকে একটুতেই ঘা লাগে। আমাদের দুজনের খাওয়া পরা নিজেই চালায়, এই ওর বিশ্বাস। আমিও তা ভাঙ্‌তে পারি না। কি করে ভাঙি বল? ওইটুকুতেই ওর কত আনন্দ!"

"তবে তুমি টাকাকড়ি পাও কোথায়?"

"কি কর্‌ব? চালের আড়তে চাল ঝাড়ি। লোকের বাড়ী আচার বেচি। এমনি করে রোজ একটাকা দেড় টাকা জুটে যায়। দেশাই মনে করে পথে পথে খেলনা বেচে বেড়াচ্ছি, আমি ততক্ষণ কাজে কর্ম্মে ঘুরি।"

আমার চোখের দৃষ্টি জলে ঝাপ্‌সা হয়ে এল। আমি একটু চেঁচিয়ে বল্‌লাম, "আহা তোমার স্বামী অন্ধ, বড় দুঃখের কথা।"

সে বল্‌লে, "তার কাছে আর খুব বেশী মন্দ কি? ওর পক্ষে তেমন নয়। পঁচিশ বচ্ছর আগের বৈশাখে যে আমি ছিলাম, আর এখনকার এই আমি, এতে যে আকাশ-পাতাল তফাৎ গো। সেই আমায় শেষ চোখের দেখা দেখেছিল।"

বুঝ্‌লাম একনিষ্ঠ প্রেমের পথ তাকে যে-দিকে নিয়ে চলেছে, সেখানে ঢুকবার সাধ্য আমার নেই।

আমি আম্‌তা আম্‌তা করে বল্‌লাম, "তা হ'লে তোমার বিশেষ দুঃখ নেই?"

"এই আছি অম্‌নি মাঝারি রকম। বেশীর ভাগ অম্‌নি কাটে। তবে মাঝে মাঝে মন ভেঙে পড়ে বৈকি! দুঃখ কষ্ট সবারই আছে। কাল রাত করে যখন বাড়ী এলাম, দেখি ঘরে একটি কাঠ কি কয়লা নেই। ভাত সিদ্ধ কর্‌ব কি দিয়ে? আহা, এই খেলনাগুলোকে বুড়ো বলে—আমার সারাদিনের মেহন্নত। সেই তার সারাদিনের মেহন্নত আমি উনোনে ঢেলে দিয়ে তবে তার পাতে চারটি ভাত দিলাম। বুড়ো জান্‌লার ধারে বসে বসে বল্‌ছিল—কাণা চোখ দুটো নিয়েও ত দুজনের ভাত কাপড় জোটাচ্ছি, ঠাকুরের কৃপায়। তার মুখ যদি তখন দেখ্‌তে!"

একখানা ট্রাম এসে পড়্‌ল। মেয়েটি তাড়াতাড়ি তার মধ্যে উঠে পড়্‌ল, আজ তাকে অনেকদূর যেতে হবে। মোড় ফিরে গাড়ীখানা যতক্ষণ না অদৃশ্য হয়ে গেল, আমি তার দিকে চেয়ে রইলুম। আমার মালতী রাঙা শাড়ী পরে চলে গেল। প্রতিদিনের মত আজও তার প্রবঞ্চনার কাজে সে চলে গেল।

শ্রীশান্তা দেবী।